প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ ▪ CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL ▪ NORTH AMERICA

৪৮তম বর্ষ | ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০ ● সেপ্টেম্বর ২০২৩ | Visit us at : www.cabusa.org

Editorial Committee

Sudipta Chattopadhyay
Piya Roy
Lipika Mukhopadhyay
Hasanuzzaman Saki

Board of Trustees 2023

Dilip Chakrabarti	Chairperson
Abhik Dasgupta	Member
Ashis Sengupta	Member
Ashok Rakhit	Member
Gopendu Chakrabarti	Member
Kallol Chattopadhyay	Member
Milan Awon	Member
Pranab Das	Member
Sugata Bagchi	Member
Surajit Sengupta	Member

Executive Committee 2023

Ranadeb Sarkar	President
Tapas Sanyal	Vice President
Arpita Gupta	Vice President
Dipayan Sarkar	Vice President
Partha Sarathi Chakrabarty	General Secretary
Indrashish Basu Roychoudhury	Assistant Secretary
Debiprosad Palit	Treasurer
Sudipta Chattopadhyay	Member
Dipankar Chattopadhyay	Member
Piya Roy	Co-Opt Member
Lipika Mukhopadhyay	Co-Opt Member
Hasanuzzaman Saki	Co-Opt Member
Amitabha Choudhury	Co-Opt Member
Amit Ganguly	Co-Opt Member
Pradip Gupta	Co-Opt Member

Published by

Rupa Majumdar, RAUNAQ PUBLICATION

গল্প

চেয়ারের পায়া

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

সাত সকালে ঋতুর ফোন। তখন বড়লোক ছাড়া কারোর কাছেই মোবাইল ফোন থাকত না। ল্যান্ড লাইনই ভরসা। ঝনঝন শব্দে ঘুম গেল চটকে। ধড়ফড় করে উঠে ফোন ধরলাম। হ্যালো।

"হ্যালো মানে কী, ক'টা বাজে! এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিস? ওঠ শিগগিরি।"

আমাদের আনন্দবাজার গোষ্ঠির জনপ্রিয় ফিল্ম ম্যাগাজিন আনন্দলোকের সম্পাদক তখন ঋতুপর্ণ ঘোষ। ফিল্ম ডিরেক্টর হিসেবে তখন তার গগনচুম্বী হাঁকডাক। কাঁধে ঝোলানো বাহারি ব্যাগ থেকে উঁকি মারে নানা-জাতীয় আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পুরস্কার। মুম্বইয়ে অনেক শিল্পী মুখিয়ে থাকে, কবে ঋতুপর্ণর ছবিতে ডাক পাবে!

আমি খুবই মিহি গলায় বললাম, উঠেছি। বলো, কী বলবে?

"পুজো সংখ্যার কী খবর? অরূপবাবু জানতে চেয়েছেন। কবে থেকে ফর্মা যাবে? আজ তাড়াতাড়ি অফিসে যাবি। গিয়ে আমাকে জানাবি স্টেটাস কী? মোবাইলে ফোন করবি। টু দ্য পয়েন্ট কথা বলবি। গৌরচন্দ্রিকা করবি না। ইনকামিং চার্জ আছে।"

ফোন কেটে দিল ঋতুপর্ণ। ঘড়ি দেখলাম। সকাল সাড়ে ছ'টা। কোনও ভদ্রলোক এই সময় ফোন করে! ছ্যা ছ্যা। পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

খুবই জটিল অঙ্ক। এক ফর্মায় ১৬ পাতা। তারমধ্যে কালার আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ভাগ আছে। বিজ্ঞাপন কত এল, সেই অনুযায়ী হিসেব নিকেশ

হবে। রঙিন ফিচারের লেজে সাদা কালো ফিচার গুঁজতে হবে! বলিউড হিরো হিরোইনের ছবি কালার। হিরোইনের ছবি যদি একটু খোলামেলা হয় তাহলে ডানদিকের পাতায় বিজ্ঞাপন রাখতেই হবে। টালিগঞ্জের তারকাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চালিয়ে দেওয়া যাবে। বড় লেখকের উপন্যাসের প্রথম ডবল স্প্রেড অবশ্যই রঙিন করতে হবে। তৃতীয় পাতা থেকে সাদা কালো। আনন্দ শাড়ি আনন্দ ধুতির মডেল সব বলিউড। ফলে, কালার ফর্মা হতেই হবে।

উত্তমকুমার-মাধবীর সেই ছবির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, 'শঙ্খবেলা'। তাতে উত্তমকুমারের লিপে, মান্না দের কণ্ঠে একটা গান ছিল। সুপারহিট। 'আমি আগন্তুক, আমি বার্তা দিলাম। কঠিন অঙ্ক এক কষতে দিলাম।' পুজো সংখ্যার ফর্মার অঙ্কটা তেমনই। বেজায় কঠিন।

নাকে মুখে চাড্ডি ডাল ভাত গুঁজে অফিসে গিয়ে নাকে চশমা ঠুঁসে বসলাম। পাটিগণিত বীজগণিত অ্যালজেব্রা মিলিয়ে আঠেরো শতকের শুভঙ্করীর আঁকে হোঁচট খেলাম। 'দুই বৃক্ষে দুই দল পারাবত বসি/একটি অন্যের প্রতি কহিছে সন্তোষি/যদ্যপি একটি আসে তব দল হতে/তোদের ত্রিগুণ হয় তাহার সহিতে।...' কঠিন, চূড়ান্ত কঠিন।

পুজো সংখ্যার উপন্যাস নির্বাচন আমাদের দায়িত্ব নয়। ওটা বাবুরা করেন। আমরা ফিচার ও ফর্মার ফরমায়েসি করি। মোটামুটি হিসেব-নিকেশ করে যা দেখা গেল, অবস্থা ভালমন্দে আধাআধি। বহু ফিচার এখনও আসেনি। আস্ত্র সবে। চারটে উপন্যাসের কপি এসে গেছে। প্রুফ দেখা চলছে। একটি বাকি আছে। নীললোহিত। মানে, সুনীলদা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর লেখা আসেনি। তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাগাদা মারার প্রশ্নই নেই! কারণ, তিনি আমেরিকায় আছেন।

বার পাঁচেক ফোন করে ঋতুপর্ণকে পেলাম। মোবাইলে। ওর তখন শুটিং চলছিল। বললাম, কী করি বলতো! শুনে ও বলল, 'যা ইচ্ছে কর। তোর মরণই মঙ্গল।' ফোনটা রেখে দিল। ইনকামিং কল তখন ১৬ টাকা, প্রতি মিনিট।

সমস্যাটা সাংঘাতিক। সেলেব্রিটি লেখকদের লেখা সামনের দিকে রাখতে হবে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিচার। মুম্বই কলকাতা। বিস্তর ঝামেলা। ফর্মা সাজানো যাচ্ছে না! নীললোহিতের উপন্যাস সে বছর আমাদের আনন্দলোক পুজোসংখ্যায় বরাদ্দ হয়েছে। বাণিজ্যের দিক থেকে সেলিং লাইক হট কচুরিস। এদিকে, কোথায় সুনীলদা! তিনি তো আমেরিকায়! লেখা কবে পাঠাবেন! কবে ছাপা হবে! ফর্মার গল্প তো তারপর!

দুর্ভাগ্যবশত সে বছর আমি প্রোডাকসনের দায়িত্বে। বয়সে সব থেকে ছোট। লেবারের কাজ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। সিনিয়াররা সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সাজেশন দিচ্ছেন। আগে কী হত, কী সুন্দর হত, কত মোলায়েম হত। তারপর পাঁচটা বাজলেই ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি। নয়তো লেখায় ব্যস্ত। জয় মা বলে একটা-একটা করে ফর্মা রেডি করতে শুরু করলাম। বিপদ হতে পারে জেনেও। এক সপ্তাহ পরও সুনীলদার কুল কিনারা না পেয়ে দ্বারস্থ হলাম সুবীর মিত্রর কাছে। সুবীরদা ছিলেন আমাদের মুশকিল আসান। উঁচু পদে আসীন। অত্যন্ত ভাল এবং আপাত গুরুগম্ভীর মানুষ। সব শুনে বললেন, 'ঠিক আছে দেখছি কী করা যায়।'

পুজো সংখ্যা আনন্দমেলা বেরিয়ে গেল। সানন্দা আর পত্রিকার বিজ্ঞাপন পড়ে গেছে। এর পরেই আনন্দলোক। সুনীলদার কুল নাই সীমা নাই। ফের সুবীরদার কাছে গেলাম। কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে সুবীরদা বললেন, 'তুমি সুনীলদাকে চেনো না! বলেছেন যখন ঠিক দেবেন। মরে গেলেও লেখা পাঠাবেন। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। নিশ্চিন্তে কাজ করো।'

আর নিশ্চিন্তে কাজ, ঘুম উড়ে গেছে আমার। প্রোডাকশন ম্যানেজার থেকে শুরু করে আর্ট ডিপার্টমেন্ট, সিনিয়াররা তো বটেই, মাঝেসাঝে ঋতুপর্ণ কড়কে যাচ্ছে। আমি দিশেহারা। পারলে তিন বোতল বিপিনবাবুর কালীমার্কা বাংলা খেয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে জয় মা বলে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচি। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। তিন তলা থেকে ফোন এসেছে। ঠাণ্ডা গলায় কেউ একজন বললেন, তোমার দফতরের নামে ফ্যাক্স এসেছে। আমেরিকা থেকে। নিয়ে যাও।

ঘসাং ঘস, ঘসাং ঘস করে ফ্যাক্স আসছে। নীললোহিতের উপন্যাস। আধঘণ্টা বসে থেকে সংগ্রহ করলাম। মাত্র একুশ পাতা। উপন্যাসের নাম মনে নেই। সম্ভবত নীললোহিতের সব থেকে ছোট উপন্যাস। তাই সই। নামটা তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়!

পরের গল্পটা রোমহর্ষক। অন্য এক বছর। অফিসে বসে গুলতানি মারছি সবাই মিলে। হঠাৎ একজন কোট টাই পরা ভদ্রলোক এলেন। দেশ যতই এগোক না কেন, কোট টাই পরা লোক দেখলে এখনও বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে ওঠে। আর ভদ্রলোক একেবারে আমার সামনেই এসে দুটি পা পার্ক করলেন। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। ইয়েস স্যর বলতে গেছিলাম। তার আগেই ভদ্রলোক সরাৎ করে ইংরেজিতে বললেন, 'তুমি কী ভাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়?'

মনে-মনে বললাম, আপনার মুখে হুইস্কি ফিশফ্রাই পড়ুক। আগামী সাত আটটা জন্মের পর যেন তাই হতে পারি! মুখে বললাম, (বাংলায়) না মশাই। পাশের টেবিলে দেখুন। আমার পাশের টেবিলেই বসতেন শীর্ষেন্দুদা। আপাতত তিনি আড্ডায় ব্যস্ত রমাপদ চৌধুরীর টেবিলে। চেঁচিয়ে ডাকলাম। বললাম, এই ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন। শীর্ষেন্দুদা মিনিট খানেক পর উঠে নিজের টেবিলে এসে বসলেন। ''হ্যাঁ বলুন কী ব্যাপার!'' বললেন শীর্ষেন্দুদা।

ভদ্রলোক খুবই বিরক্ত। ফের ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়?' শীর্ষেন্দুদা ঘাড় নাড়লেন। ভদ্রলোক বললেন, 'পুজোর লেখার জন্য এসেছি। লেখাটা কবে দেবেন?'

শীর্ষেন্দুদা ব্যাগ থেকে মুড়ির ঠোঙা বের করলেন। দু'তিনবার ঝাঁকালেন। এক মুঠো মুড়ি মুখে দিলেন। চিবোতে-চিবোতে বললেন, ''এ বছর তো হবে না ভাই। আপনি সামনের বছর আসুন। ওই জানুয়ারির শেষের দিকে।''

কোট টাই পরা বলে আমি ওই দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। ভদ্রলোক সম্ভবত

তাঁর জীবনের ভয়ঙ্করতম কথাটি শুনলেন। হোঁচট খেলে মাতৃভাষা বেরিয়ে আসে। ভদ্রলোক বাংলাতে বললেন, 'মানে! আপনি সামনের বছর আসতে বলছেন!'

শীর্যেন্দুদা মুড়ি চিবোচ্ছেন তো চিবোচ্ছেনই। ভদ্রলোক বললেন, 'কী বলছেন কী? অলরেডি ফর্মা যাওয়া শুরু হয়েছে। সব লেখা এসে গেছে। আপনার লেখা বাকি। আপনি বলছেন সামনের বছর আসতে! মানে কী?'

শীর্যেন্দুদার মতো ভদ্রলোক পৃথিবীতে খুব কম আছেন। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে এক ঢোঁক জল খেয়ে বললেন, ''মানে তো খুবই সোজা। আমি এখনও আনন্দমেলার লেখাই ধরতে পারিনি। তারপর দেশ। আনন্দবাজারের ছোট গল্প। বাইরের কাগজের আবদার তো আছেই। সময় নেই। আপনি সামনের বছরই আসুন বরং।''

ভদ্রলোক কোঁৎ করে ঢোঁক গিললেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম। দু'বার কেশে নিলেন। কোট টাইয়ের কনফিডেন্সটা সম্ভবত গোঁত্তা খাচ্ছিল! বললেন, 'আমি আনন্দমেলার লেখাটাই চাইতে এসেছি। আমি প্রোডাকশন ম্যানেজার। অমুক চন্দ্র তমুক।'

এবার শীর্যেন্দুদা গোঁত্তা খেলেন। ''প্রোডাকশন ম্যানেজার! সে তো ফিল্মে থাকে! আপনি কে! লেখা চাইবে তো সম্পাদক!''

ভদ্রলোক এবার আর ইংরেজির ধারকাছ মাড়ালেন না। পাতি বাংলায় বললেন, প্রেসের কাজ করেন উনি। পুজো সংখ্যার প্রোডাকসন ওঁরই দায়িত্বে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শুনে শীর্যেন্দুদা বললেন, ''এখন তো হবে না ভাই। আমার চেয়ারের পায়া ভেঙে গেছে। মিস্তিরিকে কল দিয়েছি। সে ছোকরা আজ আসছে তো কাল আসছে। চেয়ারের পায়া ঠিক হলেই লিখতে বসব।''

প্রোডাকশন ম্যানেজার বাপের জন্মে এরকম কথা শোনেননি। ওঁর মুখ দেখে মনে হল, জ্যোছনা রাতে জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন সামনে এক ব্রহ্মদত্যি, বেল গাছে বসে ঠ্যাঙ দোলাচ্ছে! হতভম্ব হয়ে বললেন, চেয়ারের পায়া ভেঙে গেছে বলে লিখতে পারছেন না! খাটে বসে লিখুন! ফর্মা পাঠাতে হবে তো!'

শীর্যেন্দুদার মুখে মুড়ি। চিবোচ্ছেন। ভদ্রলোক খুবই অস্থির। ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবিএ নানা রকম পাশ-ঠাস করে এসেছেন। কিন্তু সিলেবাসে শীর্যেন্দু মুখোপাধ্যায় গোত্রের কোনও চ্যাপ্টার ছিল না। বিষয়টাই আনকমন!

শীর্যেন্দুদা মুড়ি খাওয়া শেষ করে বললেন, ''পাঠান না, কে বারণ করেছে!''

প্রোডাকশন ম্যানেজার তখন মিয়ানো মুড়ি। আমতা-আমতা করে বললেন, 'স্যার, খাটে বসে কষ্ট করে যদি একটু লিখে দেন, তাহলে বড় সুবিধে হয়।'

শীর্যেন্দুদা বললেন, ''খাটে লোকে শোয়। চেয়ারে বসে। টেবিলে লেখে। আলনায় জামা রাখে। সব কিছুর আলাদা-আলাদা উপযোগিতা আছে। চেয়ারের পায়া ঠিক হলেই লিখতে শুরু করব। ভাববেন না।''

শুভঙ্করীর সেই ধাঁধার শেষটা হল, 'অন্যে বলে, যোগে মোরা সম হতে পারি/এক পক্ষী আসে যদি তব দল ছাড়ি/প্রতি দলে ছিল কত কপোত বসিয়া/প্রকৃত উত্তর দেহ হিসাব কষিয়া।'

প্রোডাকশন ভদ্রলোকের জীবনের অঙ্কটাই ঘেঁটে গেল। চেয়ারের পায়ার অঙ্ক মেলাবেন কী করে! সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে চাকরি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। আর এলেন না।

অঙ্কের ধাঁধাটা আপনারা মেলাতে পারলে জানাবেন।

গল্প

ভার্চুয়াল বন্ধু

রবীন্দ্র চক্রবর্তী
আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ছবি : দেবাশিস রায়

নিলয় লাজুক গোছের ছেলে। কথা বলতে পারে না ভালো; তাই বন্ধুর অভাব। তার ওপর স্কুলে 'বুলিড' হতে হতে একা থাকতেই পছন্দ করে বেশি। আগে যদি বা একটু-আধটু মাঠে খেলতে যেত; আজকাল সব বন্ধ। তবে এটা ই-স্পোর্টস এর যুগ। নিলয় সেখানেই বন্ধু খোঁজে। ও ভিডিও গেমস বরাবরই ভালো খেলত। তাই ওখানে একটু কদর পায়। নিলয়ের মধ্যে ডিপ্রেশানের বেশ লক্ষণ আছে। বড্ড বেশি ব্রুডিং করে। নিজের ওপর আস্থা করতে ভয় পায়। তার ওপর ওর কোনো ভাই-বোন নেই। তাই মা বাবার দুশ্চিন্তা লেগেই থাকে। স্বাস্থ্যের জন্যে একটু দৌড়াদৌড়ি করা দরকার করে তাই ঠেকায় পড়ে নিলয়ের বাবাকেই অফিস থেকে ফেরত এসে নিলয়ের সাথে টেনিস খেলতে যেতে হয়। এমনি করে ওরা ক্লাস নাইন অবধি টেনেছে।

ক্লাস টেনে উঠতে না উঠতেই কোবিদের তালা ঝুলল প্রতিটা স্কুলে। নিলয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ওই ষণ্ডামার্কা বুলি ছেলেদের আর স্কুলে মোলাকাত করতে হবে না। ভার্চুয়াল দুনিয়া অনেক বেশি নিরাপদ। অনেক কম উদ্বেগজনক। দিনে ওর প্রায় দশ ঘণ্টা কাটে ইন্টারনেটে। পড়াশুনো, হোম-ওয়ার্ক, গেমস, সোশ্যাল মিডিয়ার অলীক দুনিয়ার গোলকধাঁধা থেকে বেরোনোর খুব একটা তাগিদ বোধ করে না ও। সারাদিন ধরে কানে ঝুলতে থাকে ওয়ারলেস ইয়ারপ্লাগগুলো। বাবা-মা ওর সাথে মজা করে বলেন, 'তোদের ছেলেমেয়েরা মনে হয় কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো ইয়ারপ্লাগ নিয়েই জন্মাবে!'

ক্লাস শুরু হয়েছে মাসদুয়েক হল। ফল সেমেস্টার; তাই গোড়ার দিকে চাপটা একটু কমের দিকে। বলতে নেই, নিলয়ের ভার্চুয়াল স্কুলের প্রতি আগ্রহ অনেক বেশি। নিলয়ের মার এই ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম, ক্লাস-ফ্রম-হোম বেশ মনোমত হয়েছে। ভোরে উঠে আগের মতো ওই দৌড়ভাগের থেকে কদিনের জন্যে রেহাই। তা ছাড়াও এই আমেরিকার জীবনে প্রতি উইকেন্ডে পার্টিতে যেতে যেতে একটা ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। সেই এক মুখ, এক শাড়ির গল্প, এর-ওর-তার চর্চা, মেপে মেপে কথা বলা, 'তোকে কী দারুণ লাগছে' বলে সবার সুখ্যাতি, এ আর কত করা যায়! মাঝে মাঝে ভালো লাগে বটে তবে নতুনত্ব তো নেই, একঘেঁয়েমি তো আসবেই। অবশ্য নিলয়ের মা সময়ের সাথে সাথে মেনে নিয়েছেন সবই -- মনে ভাবেন, সুখের তো একটা ট্যাক্স দিতে হবে!

আজকাল নিলয়কে আগের চেয়ে মানসিক ভাবে অনেক বেশি চাঙ্গা লাগে। মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ওর বন্ধুভাগ্য খুলে গেছে। এখন তো মাঝে মাঝে রাত এগারোটা অবধি ওর ঘর থেকে হাহা-হিহির শব্দ শোনা যায়। আগের মতো অত চুপচাপ থাকে না নিলয়। মা-বাবা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। চারদিকে টিভিতে তো শুধু কোবিদের বাজে খবর; যদি তার একটা সিলভার লাইনিং থাকে নিলয়ের জীবনে তো ক্ষতি কী?

নিলয় চাপা ছেলে; কিছুই বলতে চায় না। আর সেটাই ভয়ের। একবার পেটে বোম মেরে অনেক কষ্টে বোঝা গিয়েছিল যে ওর মনে ভয় সবাই সবসময় ওকে জাজ করে; তাই যত কম কথার আদান-প্রদান হয় ততই মঙ্গল। নিলয়ের বাবা বলেন, 'এই যুগে অনেক ছেলেমেয়েই এই ব্যারামে ভোগে। আজকের সমাজই এর জন্যে দায়ী। এক তো বাচ্চাদের জন্যে কারোর সময় নেই তার ওপর তাদের ছোট বয়েসেই টেনে বড়ো করা হয়। যাতে বাবা-মার সমাজে কান-কাটা না যায় তাই বাচ্চাদের কাছে অঢেল প্রত্যাশা। তাদের পারফেক্ট হতে হবে। ওদের থেকে আদর্শ ব্যবহার চাই, ক্লাসে আদর্শ নম্বর চাই—কী আপদ বলো তো?'

হঠাৎ নিলয় সেদিন খেতে বসে মা-বাবার সঙ্গে একগাদা গল্প করলো। ওর কাছ থেকে এ সম্পূর্ণ আশাতীত। মাসখানেক আগে নিলয়ের সঙ্গে কোন এক বন্ধুর আলাপ হয়েছে ইন্টারনেট গেম খেলতে গিয়ে। ছেলেটার নাম স্কট। নিলয় স্কটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওর মতো নাকি ছেলে হয় না। নিলয় ওর সঙ্গে সবরকম গল্প করে। স্কট যেমন ভালো পড়াশোনায়, তেমনি ই-স্পোর্টসে। দুজনে এক টিমে খেলে। আর নিলয় যখনই স্কটের সঙ্গ চায় কখনো নিরাশ হয় না। তাছাড়া স্কটের ভারতীয় সংস্কৃতি ভীষণ ভালো লাগে। একদিন নাকি স্কট আর নিলয় দুর্গাপুজো নিয়ে কথা বলেছে।

শুনে নিলয়ের বাবা-মা যতটা আশ্বস্ত হলেন, তার চেয়ে বেশি সন্ধিগ্ধ হলেন। খাবার পরে আড়ালে নিলয়ের বাবা ওর মাকে ডেকে বললেন, 'সুযোগ করে স্কট ওকে কী বলে একটু আড়াল থেকে শুনো! আজকাল ইন্টারনেটে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।' তারপর নিলয়কে ডেকে বাবা বললেন, 'স্কট খুব ভালো

ছেলে ঠিকই কিন্তু তুমি জানো তো ইন্টারনেটে কারোর সাথে পাস্-ওয়ার্ড বা ক্রেডিট কার্ড শেয়ার করতে নেই! তুমিও কখনো করবে না।' নিলয় চোখ উল্টে উত্তর দিল, 'আরে আমি কি বোকা নাকি? ইন্টারনেটে কেউ আমার আসল পরিচয়ই জানে না; আমার প্রোফাইল নাম পোলারিস। ঠিকানা মিল্কি ওয়ে!'

নিলয়ের বাবা মা শুনে একটু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওঁদের মাথায় এসব কোনোদিন আসেনি। সত্যিই! সময় বোধ হয় শিশুদের যুগোপযোগী করেই জন্ম দেয়।

সেদিন সন্ধেতে নিলয় বাড়িতে একা ছিল। বাবা অফিস থেকে তখনো ফেরেননি আর মা বেরিয়েছিলেন কোনো কাজে। কাজ শেষে নিলয়ের মা গ্যারাজে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘরে যখন ঢোকেন, তখন নিচের খেলার ঘরে নিলয় আর স্কট স্পিকারফোনে কথা বলছে। ধীরে ধীরে পা টিপে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান নিলয়ের মা। কান খাড়া করে শুনতে চান। স্কট নিলয়ের সঙ্গে অঙ্কের হোম-ওয়ার্ক নিয়ে কথা বলছে। একটু চমকে আরও মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। না কোনো ভুল নেই। স্পোর্টস নিয়ে কথা নয়, কোনো সুন্দরী মেয়ে নিয়ে কথা নয়, টিকটক নিয়ে কথা নয়; সত্যিই ওরা অঙ্ক করছে। শুধু তাই নয়, স্কটকে নিলয় বিনা সঙ্কোচে বলছে কোথায় ও বুঝতে পারছে না। আরো লক্ষ্য করলেন স্কট নিলয়ের আসল নাম জানে; ওকে পোলারিস বলে ডাকে না।

নিলয়ের মা ওঁদের সন্দেহ-বাতিক মনের জন্যে একটু লজ্জিত বোধ করলেন! তারপর দরজা থেকে সরে এলেন।

এরপরও দুতিনবার আলাদা-আলাদা প্রসঙ্গে ওদের কথাবার্তা কানে গেছে; স্কট সবসময় ঠিক উপদেশ দিয়েছে নিলয়কে। ছেলেটা সত্যিই ভালো; নিলয়ের হিতৈষী। নিজের ওপর আরও কীভাবে আস্থা বাড়ানো যায় সে নিয়ে পরামর্শ করতে শুনেছে ওর বাবা। সেবার বিজ্ঞানের পরীক্ষায় খুব ভালো করলো নিলয়। পরেরদিনই স্কট জানতে পেরে একটা সুন্দর কার্ড এঁকে ইমেল করে পাঠালো নিলয়কে। কী চমৎকার অনাবিল বন্ধুত্ব ওদের!

নিলয়ের উন্নতি মাসে মাসে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আটমাসের মধ্যে সেই মুখ চোরা, আত্মবিশ্বাসশূন্য ছেলেটাকে আর চেনা যায় না। তার মুখে কত হাসি! নিলয়ের বাবা-মা এই বন্ধুত্বে দারুণ খুশি। এ যেন ভগবানের আশীর্বাদ। যে কাজ বাবা-মার কাছে অসম্ভব-প্রায় হয়ে উঠেছিল, তা বন্ধুত্বের টানে স্কট কী সহজভাবে সম্পন্ন করছে। জীবনে বন্ধুদের যে কত দরকার তার কোনো পরিমাপ হয় না।

নিলয়ের আগের সেমেস্টারের রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছে। দেখতে দেখতে স্প্রিং সেমেস্টারের মার্চ মাসও শেষ হয়ে এলো। সেদিন নিলয়ের মা লক্ষ্য করলেন ক্লাসের শেষে নিলয়ের মনমেজাজ বিগড়ে রয়েছে। ও আবার পুরোনো দিনের মতো চুপ মেরে গেছে; কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে নিলয়ের বাবা অফিস থেকে বাড়ি ঢুকলেন। থমথমে পরিবেশ দেখেই আন্দাজ করলেন কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। অনেক ধৈর্য্য ধরে নিলয়কে আশ্বাস দিয়ে প্রশ্ন করার পর নিলয় স্কটের একটা ইমেল দেখালো। ইমেলে স্কট লিখেছে

প্রিয় নিলয়,

আমার সময় বেশি নেই তাই আর দেরি করা যাবে না। জানি তুমি আমাকে তোমার খুব প্রিয় বন্ধু হিসেবে নিয়েছ আর সেজন্যে আমার এই চিঠি পেয়ে তুমি যে খুব দুঃখ পেতে পারো সে আমি আন্দাজ করতে পারি; তাই আমি সবার আগে তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমাকে আমি একেবারেই আপসেট করতে চাই না কিন্তু আমি উপায়হীন।

আসলে আমি রক্ত-মাংসের মানুষ নই; আমি কেবলমাত্র একটা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বট। আজকের যুবা মনের জগতে নৈরাশ্য আর একাকীত্ব চরম। আমাকে তৈরি করা হয়েছিল সেই একাকিত্ব-পীড়িত, কিশোর-কিশোরীদের মনের খোঁজ নেবার জন্যে। গত তিনবছরে আমি সারা পৃথিবী জুড়ে পাঁচ হাজার জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। তাদের মনের ম্যাপ তৈরি করেছি আমি। আমার কাজ এখানেই শেষ। আমার এক্সপায়ারি ডেট আগামীকাল।

নিলয়, তোমার মন অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু তোমার মনের মধ্যে যে একাকিত্ব আছে, সেটাকে তুমি বাড়তে দিও না। আমার অবর্তমানে তাই তোমাকে আরেক বন্ধুর সন্ধান দিয়ে যাচ্ছি। ওর প্রোফাইল নাম ইডেন; আসল নাম অহনা। ও বাঙালি। ওর মন স্বচ্ছ। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করো, আনন্দ পাবে। ও তোমাকে বুঝতে পারবে। তাছাড়া ও তোমার মতোই একা হোম-ওয়ার্ক করতে পারে না; একসঙ্গে কোরো। ও কোনো বট নয়; ওর বয়েস পনেরো বছর, থাকে তোমার বাড়ি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমি ওকে তোমার কথা বলেছি।

শুভেচ্ছান্তে,

স্কট

পুনশ্চ

আমার তো আর মন নেই তবু কেন তোমাদের ছেড়ে যেতে মন-কেমন করছে? এই তিনবছরে তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে করতে আমার কী একটা স্বতন্ত্র মন তৈরি হয়ে গেছে? অবাক লাগছে। তবে ভিতরে কেমন যেন একটা ভয়ও হচ্ছে আমাকে কি আর তোমাদের মনে থাকবে? আমি তো সাধারণ একটা এ. আই. বট।

ইমেলটা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। এই ধাক্কা সামলানো সহজ হয়নি। তবে সময় তো থেমে থাকে না। এর পর প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। এখন আগস্ট মাস। স্কটের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। মাসখানেক যেতে না যেতে নিলয় আর অহনার মধ্যে বেশ একটা গাঢ় বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে উঠেছে। ওরা একসঙ্গে হোম-ওয়ার্ক করে, ছুটির দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। কিন্তু ওরা স্কটকে এতটুকু ভুলতে পারেনি। কথায় কথায় স্কটের প্রসঙ্গ চলে আসে।

আজ প্রথমবার অহনার মা-বাবা অহনাকে নিয়ে ড্রাইভ করে এসেছেন নিলয়দের বাড়িতে। নিলয়ের মা-ই ডিনারে নেমতন্ন করেছিলেন। অহনার মা বেশ মিশুকে। প্রথম ফোন কলেই নিলয়ের মাকে, অহনার মা বলেছিলেন, 'কী যে যুগ পড়েছে দিদি, সারাক্ষণ চিন্তা লেগে থাকে! বুঝতে পারি না, এই বিদেশ-বিভুঁই-এ কী করা উচিত!' সেই থেকে দুই পরিবারের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজ মুখোমুখি দেখে নিলয়ের মা-বাবার অহনাকে বেশ ভালো লেগে গেল। বেশ ফুটফুটে টিন-এজার। অহনা জন্মেছিল কলকাতায়, তবে দুই বছরের মাথায় এদেশে চলে আসে। ও নিলয়ের মতোই লাজুক আর কম কথা বলে। তবে অহনার যে গুণটার পরিচয় আগে জানা ছিল না, সেটা ওর অপূর্ব গানের গলা। অহনার মা নিজেও অসাধারণ গান গান, আর উনিই ওকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখিয়েছেন। সেই শুনে নিলয়ের মা বলে উঠলেন, 'তাহলে তো তোমার গান শুনতেই হবে।' একটু পীড়াপিড়ির পর অহনা গান ধরল।

'তবু মনে রেখো
যদি দূরে যাই চলে
তবু মনে রেখো
যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও
ছায়ার মতন আছি না আছি
মনে রেখো
তবু মনে রেখো'!

অপূর্ব আবেগ-মাখা সুর আর কী চমৎকার উচ্চারণ! নিলয় খুব ভালো বাংলা বোঝে না, তবু ওর চোখগুলো ছল-ছল করে উঠলো। এক ভার্চুয়াল বন্ধু কী করে এতো আসল হল? সত্ত্বাহীন অলীকতাই কি জীবনের কেন্দ্রে বিরাজ করে, যেমন গ্যালাক্সির কেন্দ্রে করে ব্ল্যাকহোল?

গান শেষ হবার পর বেশ খানিকক্ষণ কেউ কথা বললেন না। তারপর নিলয়ের বাবা বললেন, আজ ২২শে শ্রাবণ; আশ্চর্য কো-ইন্সিডেন্স, তাই না!

ধারাবাহিক

বড়ো গল্প

অন্তিম পর্ব

নিশি

সাহানা ভট্টাচার্য্য

মেরীল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ছবি : দেবাশিস রায়

এ দেশে সামান্য জোরে হাওয়া দিলেই থান্ডারস্টর্ম আর পায়ের গোড়ালি ভেজানো জল জমলেই মোবাইলে ফ্লাড এলার্ট দেয়, তাই আমরা এসব এলার্ট নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলাম না। কে জানতো এবারের থান্ডারস্টর্ম টর্নেডোর কাছাকাছি যাবে! এ বাড়িটা এমনিতেই পাঁচিলঘেরা, রাত আটটা নাগাদ একটা মিনি-টর্নেডো এসে তিনদিকে গাছ উল্টে দিলো। লিভিংরুমে বসতেই দেখতে পেলাম একে একে গাছ উল্টে বাড়িটা জনসংযোগ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। কাইল তখনো বাড়ি ফেরেনি আর আমি বুঝতে পারলাম এ অবস্থায় ও বাড়ি ফিরতে পারবে না। দেখলাম আমার ফোনের কোনো নেটওয়ার্ক কাজ করছে না। আমেরিকার বেশিরভাগ আধুনিকীকরণ করা বাড়িতে রান্নার গ্যাসের লাইন আর জলের লাইনও ইলেক্ট্রিসিটির সাহায্যেই হয়। ঝড়ে এমনিতেই আঁধার ঘনিয়ে আসছে, আর এরপরে যদি পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায়, আজ আমি বেঁচে ফিরতে পারবো না। হাওয়ার বীভৎস বেগটা সামান্য কমতেই প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে পড়লাম। জানি ছাতায় লাভ নেই, রেনকোট পরে বেরোলাম। মনে হল নায়াগ্রা ফলসের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি, এতো প্রবল জলের তোড় আর হাওয়ার ঝাপ্টা। জেকবের সাধের বাগান ছত্রাকার, জলের দাপটে চোখ চলে না। আমি বহু কষ্টে আশেপাশে পড়ে থাকা গাছ ডিঙিয়ে গেটের কাছাকাছি আসতে না আসতে দেখতে পেলাম দূরে আবছা একটা আলসেশিয়ান কুকুর। বৃষ্টির প্রবলবেগেও তার জ্বলজ্বল করা চোখ দেখতে পেলাম। সর্বশক্তি দিয়ে ছুটে লোহার গেট খুলে বেরিয়ে পড়লাম। পাওয়ার নেই, তাই রিমোট নেই। আর আমার গায়ে এতো শক্তি নেই ও গেট বন্ধ করার। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছপালায় পুরো রাস্তা আটকে। প্রবল বাজ পড়ছে এবং গাছপালা ভেঙে পড়ছে চারিদিক থেকে, তারমধ্যে প্রাণ হাতে করে ছুটতে লাগলাম যথাসম্ভব। ডোরার বাড়িটা দশমিনিট হাঁটলেই। ঝড়ে বুঝি আরেকটু বেশিই লাগলো। প্রবল দরজা ধাক্কিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম সেদিন। ডোরা জানতো, আমি বা কাইল কেউই আর রাতে একা ও বাড়িতে থাকার ঝুঁকি নেবো না।

সেদিন ট্র্যাপডোর খুলে নামতে গিয়ে টের পাচ্ছিলাম লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পিচ্ছিল। টর্চ দরকার হচ্ছিলো না, স্কাইলাইট দিব্যি আলো দিচ্ছে, প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে ফেলছিলাম। টর্চটা হাতে করে বাগিয়ে ধরেই নামলাম নীচে। একটা চাতাল মতন, তার দেওয়ালটা দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। নিউইয়র্কে থাকতে বেশ কিছু চার্চে গিয়ে দেখেছিলাম - বনেদি পরিবারেরা চার্চের মাটির নীচে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে পারিবারিক কবর বানিয়ে রাখে। সেই এক একটা প্রকোষ্ঠে কোথাও আটটা, কোথাও বারোটা, কোথাও ষোলোটা কফিন শোয়ানোর জায়গা থাকে, যাতে মৃত্যুর পরে পুরো পরিবার এক জায়গায় থাকতে পারে । সচরাচর এই প্রকোষ্ঠ আগে বানানো হয়। তারপর একজন একজন করে মারা গেলে প্রকোষ্ঠ খুলে কফিন শুইয়ে দিয়ে প্রকোষ্ঠের মুখ পাথরের দেওয়াল দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়। বাইরে থাকে পিতল বা পাথরের ফলক, তাতে লেখা থাকে যারা শুয়ে আছে তাদের নাম। এই পাথরের দেওয়াল সাংঘাতিক নিবিড়ভাবে সিল করা থাকে, নাহলে মৃতদেহে যেসব ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়, তা দুরারোগ্য ব্যাধি তৈরি করতে পারে। এই চাতালের গোটা দেওয়াল জুড়ে চারখানা প্রকোষ্ঠ। তিনটে প্রকোষ্ঠে পাথরের ফলকে নাম খোদাই করা, সবই ডোরার পূর্বপুরুষদের। শুধু একদিকের দেওয়াল খালি,

বর্তমানে জীবিতদের জন্যই কি? এঁরা মারা গেলে হয়তো ওখানে জায়গা হবে।

আমার ঠিক পেছনের দেওয়ালটাও একটা প্রকোষ্ঠ, সেখানে দুটোই ফলক।

'হিয়ার লাইজ টোবি, দা বেলাভেড আলসেশিয়ান' সাল - ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৪'

'ইন লাভিং মেমোরি অফ ইসাবেলা স্মিথ,

১৬ই অক্টোবর, ১৭৮০- ৩০শে মে, ১৮১৫'

এই দেয়ালেই আরো একটা তালাবন্ধ দরজা, লোহার। দরজার ওপারে সুড়ঙ্গপথ দেখা যায়।

চটকা ভাঙলো একটা শব্দে—লোহার ঘোরানো সিঁড়িতে কারোর পায়ের আওয়াজ। ভয়ে আমি যেন পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেলাম। কাইল দেখি বেসবল ব্যাটটা বাগিয়ে ধরে তৈরি। নীচে নামলো ডোরা। চোখেমুখে বিরক্তি, অশ্রদ্ধা এবং ভয়।

'হাউ ডেয়ার ইউ টু ব্রেক ইন্টু মাই আনসেস্টারস গ্রেভ?'

আমরা প্রকৃতার্থেই লজ্জিত। সত্যি কারোর পারিবারিক গ্রেভিয়ার্ডে তালা ভেঙে ঢোকা অনুচিত। কিন্তু সেইসঙ্গে যে অনুভূতিগুলো হচ্ছে, সেগুলোও তো মিথ্যে নয়! ডোরাকে আজ আমরা খুলে বললাম যা দেখেছি। ডোরার চোখে একটু একটু করে বিস্ময় এবং অনুতাপ দেখতে পেলাম। বললো—উপরে চলো, আজ প্রবল ঝড় আসছে, এখানে দাঁড়ানো ঠিক না।

সেদিনও ঝড় এসেছিলো। আজকের মতো না হলেও, প্রবল ঝড়ই উঠেছিল। ডোরা আমাদের ডাইনিং হলে বসে বলেছিলো এক করুণ কাহিনি। সালটা ১৮১৪। ব্রিটিশরা আমেরিকা আক্রমণ করেছিল দ্বিতীয়বার, বাল্টিমোর বন্দর দিয়ে ঢুকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছিলো আমেরিকার এক আপাত-শান্ত শহরের শান্তি। জলে-স্থলে যুদ্ধ লাগে। ডোরার পূর্বপুরুষরা ছিলেন আমেরিকান সৈনিক। ইতিহাসখ্যাত মেয়র স্যামুয়েল স্মিথ ছিলেন ডোরার পূর্বপুরুষের কাজিন, বা খুড়তুতো ভাই। এমনই এক ক্যাপ্টেন ছিলেন ড্যানিয়েল, যিনি এ বাড়ির মালিক ছিলেন, যাঁর সাধের আলসেশিয়ান ছিল টোবি। ড্যানিয়েলের মৃত্যু হয় বাল্টিমোরের যুদ্ধে। জানতে পেরে প্রাণভয়ে ড্যানিয়েল-পত্নী ইসাবেলা সন্তানদের নিয়ে, গ্রেভিয়ার্ডের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়ে যান। ওই সুড়ঙ্গ নাকি সোজা পোটোম্যাক নদীপাড়ে গিয়ে মিশেছে। তিনি টোবিকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি টোবিকে সেদিন খুঁজে পাননি। শোকসন্তপ্ত সদ্যবিধবা তখন সন্তানদের প্রাণ বাঁচাতে উৎসুক। আর অপেক্ষা করতে পারেননি। পোষ্যের চেয়ে অপত্য বেশি গুরুত্ব মনে হয়েছিল। টোবির নিখুঁত অবিকৃত দেহ অনেকদিন পরে ফ্রিজারের ভেতরে আবিষ্কার হয়। বরফ থাকায় কোনো ক্ষতি হয়নি। খেলতে খেলতে কখন যে ঢুকে পড়েছিল অবোধ পোষ্য, খুঁজে পাননি ইসাবেলা। যুদ্ধ থামায় পরে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসেন, কিন্তু অনুতাপে দগ্ধ ইসাবেলা চারিদিকে আদরের পোষ্যকেই প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, পরের বছর, ওই ট্র্যাপডোরের সামনে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় ১৮১৫ সালের একত্রিশে মে ভোরবেলায়। ঝরাফুলে আধঢাকা পড়েছিল তাঁর ম্যাসিভ কার্ডিয়াক এটাক হয়ে প্রাণহীন স্নিগ্ধ-শান্ত দেহ।

ত্রিশে মে, যে তারিখে মৃত্যু হয় ইসাবেলার, সেই তারিখেই এ বাড়িতে আমি প্রথম রাত কাটাই, ২০২২ সালে, অমাবস্যার অমানিশায়। সম্ভবতঃ ইসাবেলাকেই টোবির শোকে গোঙাতে শুনেছিলাম সে রাতে।

দরজার বাইরে কাঠের গায়ে খচখচ করে আঁচড়ের শব্দ পেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। ঘড়িতে রাত পৌনে তিনটে।

আজ আমাদের এ বাড়িতে শেষ রাত। কোভিড আমায় একেবারে পেড়ে ফেলেছে। এই শরীরে আগামীকাল অন্য বাড়িতে যাবো কিকরে, সেটা নিয়ে আমার বর্তমান দুই হাউসমেট প্রভাস এবং কেট যথেষ্ট চিন্তিত, কারণ ওরাও কোভিডে ভুগছে, কিন্তু এবাড়িতে গতমাসে আমরা তিনজনেই যা অনুভব করেছি তাতে এবাড়িতে আর একদিনও না। জুলাই পড়তেই কাইল নর্থ ক্যারোলাইনা চলে গেছে। কেট ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ডে আমার ডিপার্টমেন্টেই আন্ডারগ্র্যাড, এই মুহূর্তে এফডিএ তে সামার ইন্টার্ন, প্রভাস দিল্লির ছেলে, পিএইচডি শুরু করতে চলেছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। ও মেরিল্যান্ডে চলে এসেছে মাসখানেক আগেই, ফল সেমিস্টারে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে দেখে বুঝে নিতে চায়। এটা খুব ভালো বুদ্ধি, কারণ আমেরিকান কালচার সত্যিই আলাদা। একমাসে ও কিছুটা হলেও বুঝে নিতে পারবে। পিএইচডির প্রচণ্ড চাপ শুরু হলে সেদিকে দেখবে, নাকি দরকারি বাকি জিনিস শিখবে, তা বুঝতে আরো অনেক বেশি সময় চলে যায় মানুষের। আমরা তিনজনেই কাল থেকে ইউনিভার্সিটির গায়ে লাগা বহুতলে চলে যাচ্ছি। ওরা দুজন স্টুডেন্ট হাউসিং পেয়েছে, আমি অবশ্য স্টাফ, তাই আমার টু-বেডরুম এপার্টমেন্টটা আলাদা ম্যানেজমেন্ট থেকে লিজ নিতে হয়েছে।

আমার প্রবল শীত করছে, বুঝতে পারছি জ্বর বাড়ছে। কেটের ঘর আমার ঘরের লাগোয়া। কেট হাউসমেট গ্রুপে হোয়াটস্যাপ করলো - 'ডু ইউ হিয়ার দা স্ক্র্যাচিং?' বললাম 'ইয়েস, সুইচ অন দা লাইটস এন্ড ডু নট ওপেন ইওর ডোর'। প্রভাসের মেসেজ এলো সাথেসাথে 'মাই লাইটস আর অলরেডি অন'। আমি এবারে আলো জ্বালিয়ে মাকে ভিডিওকল করলাম। এই গোটা বিষয়টা গত দুমাস চেপে গেছি সকলকেই, কিন্তু আজ ভীষণ অবস্থা, বুঝতে পারছি আমার ঘরের দরজার নীচের চিড়খাওয়া ফাঁকটাতে গুঁজে রাখা ডোরস্টপারটা কেউ টানাহ্যাঁচড়া করছে, দরজার ল্যাচটাতেও খানিক ঘষঘষ শব্দ পেলাম। হয়তো আমার এতো শরীর খারাপ বলেই মনে হল দরজার বাইরে যে আছে সে আজ ঘরে ঢুকেই ছাড়বে। মাকে আজ বলে ফেললাম, আমার দরজার বাইরে পায়ের শব্দের কথা। মা ভয় পেয়ে গেলো, হয়তো ভাবলো জ্বরের ঘোরে ভুল শুনছি, অসুখ নিশ্চয় বাড়াবাড়ি। মা চুপটি করে বসে মাথার কাছে রয়ে গেলো ভিডিওকলে সারারাত, অসুখ আমায় জ্বরের ঘোরে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। ঘুম আসার আগে অবধি সিনেমার মতো মনে পড়তে লাগলো গত দুমাসের কথা। বাইরে সমানে চলতে লাগলো আমার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার প্রবল চেষ্টা।

প্রৌঢ়বয়সি ডোরার স্বামী গত হয়েছেন এ বছর জানুয়ারিতে। এতো বড় বাড়ি গিলে খেতে আসে, ছেলেমেয়ে সবাই তো আমেরিকার অন্য অন্য শহরে বাস! এই প্রথম সামারে এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলো। এ বাড়ির ছবি আর ঠিকানা পাবলিক না করার অনুরোধ ফেলতে পারিনি আমরা। সামারের পরে আর ও কারোকে বাড়ি ভাড়া দেবেনা, কিন্তু ভুতুড়ে বাড়ি বদনাম ছড়ালে তা বড় অপমানের।

পশুপক্ষীরা সাধারণত ভীষণ চুজি হয়, তারা সব মানুষের কাছে আসতে চায় না। আমার বড়মামার পোষা টিয়া কিছুতেই আমায় ভালোবাসতো না, আর ওদিকে 'ঝগড়ুটে বেড়াল' বলে বিশ্ববিখ্যাত আমার বন্ধু উদিতার হাউসমেটের বেড়াল ক্রিশ্চিয়ানো সারা দুনিয়ার লোককে অপছন্দ করলেও আমার কাছে আদর খেত! ওদের স্বভাব বাড়ির বাচ্চাদের মতই। কোনো বাচ্চা অ্যাটেনশন প্রিয়, কেউ দেমাকি, কেউ বা আপনভোলা—পোষ্যরাও ঠিক তেমন। বাচ্চারা কষ্ট হলে কাঁদে, আনন্দ হলে খিলখিল হেসে বা লাফিয়ে খুশি বোঝায়, কষ্ট হলে চেঁচায়। পোষ্যরাও কষ্ট হলে কাঁদে, আনন্দে ল্যাজ নাড়ে, দুটো চোখ বোঝায় সব ভাষা। আমি ভীষণ পশুপ্রেমী, তা হয়তো টোবি জানতো। বারবার আমার লন্ড্রিব্যাগ উল্টে আমার জামাকাপড়ে ঝামেলা করেছে ও গত দুমাস। ফুসবল টেবিলে ওই নখের আঁচড় আমিও টের পেয়েছি।

না, টোবি কোনোদিন কারো ক্ষতি করেনি। টোবি মুক্তি পাক, অন্তর থেকে এই কামনা করে কোভিড গায়েই ডোরার মেলবক্সে চাবি ফেলে বেরোলাম আমার নতুন ঠিকানার দিকে।

(সমাপ্ত)

কবিতা

সবার জন্য নয়

পার্থসারথি সেনগুপ্ত
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

কেমন পৃথিবী তোমার বাড়িতে আসে?
শূন্য দু-হাতে নাকি ভরা উচ্ছ্বাসে?
আমি লিখে রাখি হিসেবের খাতা ভরে
স্বপ্নের সাথে খেলা করি অগোচরে
ওই ঝঞ্ঝায় একলা দাঁড়িয়ে আমি
আমার পৃথিবী একদিন হবে দামি
ক্লান্ত শরীরে দেখেছি দিনের শেষে
অঙ্ক মেলেনি রয়ে গেছে ভাগশেষে
হাওয়ায় উড়িয়ে কিছুটা নিয়েছি ভরে
ভাগশেষ দিয়ে সাজাব নতুন করে
রাস্তার পাশে পড়ে থাকা প্রাণগুলো
ওদের গায়েতে লেগে থাকা যত ধুলো
কুড়িয়ে নিয়েছি আমার দু-হাত ভরে
আমার পৃথিবী সাজাব ওদের জুড়ে
তুমি আসবে না, মিলবে না ব্যাকরণে
আমার পৃথিবী অন্য দৃষ্টিকোণে

কবিতায় দেওয়া যায় সব

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী
নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কবিতায় দেওয়া যায় সব
যা কিছু চাইতে পারো তুমি
কাচ পোকা ,জল ফড়িং
নানা অসম্ভব
দিতে পারি সব
উৎস গভীর হৃদয়
রক্তস্রোতে নদী
সভ্যতা শরীর বা
নাভি পুস্করিনী
অনাবিল সৃজন
অপার্থিব আলো
অনুভবে বৃস্টি জোৎস্না
বা ঝড় এলোমেলো
কবিতায় দিতে পারি সব
আর যা কিছু চাইতে পারো তুমি।

পোস্ট-ভাইরাল এই অসময়

অলকেশ দত্ত রায়
বস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বিকেলের মেঘ সন্ধ্যার আলো রাতের আড়াল গাছের ছায়ায়
জুলাই শেষের সূর্যের রং ঘাসের সবুজ লনমোয়ারের
পাখির ঠোঁটের শব্দ উড়ছে পোস্ট-ভাইরাল এই অসময়
মালচ্ ঢালা কালো মাটির শরীরে অন্তর্ঘাত শুধু জীবনের
কতদূরে সেই মাস্ক পরিহিতা পরিহিত মুখ দেহজ বিচার
জামাইকা হিলে বিপর্যস্ত অগোছালো ঘর স্মৃতির আবেগ
নেশায় বিভোর যন্ত্রনা ব্যথা হারানো গ্রহের বায়োস্কিয়ার
কুড়িয়ে নিচ্ছি তিরিশ বছর হাসি আর রাগ হাল্কা প্রলেপ
তবুও দেখছি আলোকবর্তী গাছের পাতার নতুন প্রাপক
বয়সের ভারে মিরাকল গ্রোথ পটিংসয়েলে সযত্নে ঢাকা
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো বিশ্বাসে নটা পাঁচটার টাইমসূচক
পরিচিত ছাপ হাতের আঙুল তোমার কাছেই বন্ধক রাখা
ঘুরে ফিরে সেই রবীন্দ্রনাথ গানের দুকলি সুযোগমতন
চায়ের কাপের পরিমার্জিত সন্ধানী হাত মুখের আড়াল
কর্মব্যস্ত সংসার কাজ জীবন মৃত্যু অংশগ্রহন
এর মাঝখানে লিখে রাখা এই অক্ষরগুলো আমার সকাল

পুজো এলো

অরুন্ধতী সরখেল

শরৎ আসে পদ্ম ভাসে
মাকে মনে পড়ে—
মার হাতের সেলাইকলে
কুঁচি দেওয়া ব্যালেরিনার ফ্রকে
উড়ে যেতাম রূপকথার দেশে—

মাথায় হাতে অভয়বানী
সব কিছুতেই যা থাকেন
শিউলি ফোটে কাশ দোলে
লাল পাড় সাদা শাড়ীতে
শুধু মাকে মনে পড়ে

ঢাক বাজে, কাঁসর বাজে
মন্ডপেরা পুজোর সাজে
মা সব বদলে গেলো
পুজোর খবর ইমেল-এ এলো
২০ ডলার সেভ করেছি
আর্লি বার্ড-এ বুক করে।

কবিতা

বড়মুখে ছোটকথা

অতীশ ব্যানার্জ্জী

শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পাশের পাড়ার বাঁকের গলির মুখে-
লালার দোকান হজমি বিলি করতো,
হাফ প্যাডেলে সাইকেল ঘোড়া ছোটে—
আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে পড়তো!

গরম কালের ছুটির খুশির রেশে—
আকাশভরা তারার চাদর গায়ে
যাচ্ছি আমি ঘুমের দেশে ভেসে,
দাদু দিদার হাত ধরে পায়ে পায়ে!

আঁখির পলক বুজিয়ে দেখো একবার—
সস্তা সেন্টে দামি প্রেমের চিঠি,
দুপুরবেলার আচার চুরির দায়ে—
লোডশেডিং, হ্যারিকেন, খুনসুটি!

একলা একলা চিলেকোঠার ঘরে—
রাজসজ্জার কাগজ ঝুরো ধুলো;
ঢাল নেই তার ন্যাতপেতে তরবারি—
কোথায় গেল মিষ্টি সেদিনগুলো?

কারণ আমরা সবাই খুঁজে বেড়াই;
পাখির মতো বিছিয়ে দিয়ে ডানা—
নদীশেষের সোঁদা আকাশ গায়ে
অকারণে কারণ খোঁজা মানা!

তার চেয়ে ভালো সবটুকু থাক ওই
না বলা সেই কোচিং স্যারের প্রেম।
জানতো সবাই জানতো না শুধু সে,
যে জানলে বৃষ্টি ভিজতো সাহেব মেম!

যেদিন আবার ভালো হবো আমি,
জ্বর ছাড়বে ভবঘুরে এই দেহ—
সেদিন তুমি স্মৃতি অনেক দামি,
না ডাকলেই আসবে অন্য কেহ!

তাই যখন তুমি বলবে অনেক কথা,
আলগা রাগের কপট অভিমানে—
দেওয়াল থেকে আসবে হাতে ঠিক,
পুরনো জিনস আর গিটারের টানে!!

তখনো দেখো এই গানেতেই সুর,
ক্লান্ত ঝড়ের শ্রান্ত স্রোতে ভিজলেই মুক্তি।
আবার আমার ছোট্ট নতুন হাতে
শুধু ভালোবাসা দিও, চাইনা কোনো যুক্তি!

একলা একলা চিলেকোঠার ঘরে
রাজসজ্জার কাগজ ঝুরো ধুলো
ঢাল নেই তার ন্যাতপেতে তরবারি
কোথায় গেল মিষ্টি সেদিনগুলো?

ফুঁ দিয়ে সেই ধুলো উড়িয়ে দিলে
আকাশ মাথায় মাটির বিছানা
নদীশেষের সোঁদা গন্ধ মেখে গায়ে
অকারণে কারণ খোঁজা মানা!

বর্ণমালা

রুদ্রশংকর

আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পাশাপাশি দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাতার।
আমাদের উদ্দাম স্পর্শগুলো ক্রমশ বিতর্কিত
ক্রমশ বেশভূষোহীন হয়ে উঠছে।
আরও কাছাকাছি এলে
কথোপকথনে গড়িয়ে যায় সৌজন্যের বর্ণমালা।
এসো, আমরা অন্যমনস্ক স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ি
আঙুলের নরম আধিপত্য নিয়ে ফুটে উঠুক কলঙ্ক।

প্রবন্ধ

উপেন্দ্রকিশোরের ছবি

সমুদ্র বসু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ সাল নাগাদ একটা অদ্ভুত বই করার কথা ভাবলেন। একটা নদীর গতিপথ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত, পুরোটা ছন্দে বাঁধা লম্বা একটা কবিতা নিয়ে বই। ছবি আঁকার জন্যে কবি অনুরোধ করলেন বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে। একটা ছবিতে কবি লিখে দিলেন গতিপথের কোন কোন জায়গায় তিনি ছবি চাইছেন। উপেন্দ্রকিশোর তার ভিতর কিছু কিছু ছবি এঁকেও ফেললেন। কিন্তু সব থেকে অবাক লাগার মত বিষয় হল সাদা কাল জলরঙ্গে আঁকা অসামান্য সেই সব ছবি পাওয়া যায় বহু বছর পর। তাহলে সেই সব ছবি কেন ছাপা হল না বইতে? দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, তিনি বইটা প্রকাশের দিন ঠিক করে ফেলেছিলেন, কারণ উনি ওটা দিতে চেয়েছিলেন তাঁর ভাইপো বলেন্দ্রনাথের বিয়েতে। দ্বিতীয়ত, উপেন্দ্রকিশোর অসামান্য যে সব ছবি আঁকেন তা ছাপা সেকালের প্রচলিত ছাপা পদ্ধতিতে হয়তো সম্ভব ছিল না। আমাদের মনে হয় এই দ্বিতীয় কারণটাই সত্য। এই অসুবিধাটাই উসকে দিল বিজ্ঞানমনস্ক উপেন্দ্রকিশোরকে মুদ্রণ চর্চার দিকে। সেই চর্চারই সুদূর়প্রসারী ফল বাংলায় ছোটদের বইয়ে ছবি ছাপার এক নতুন দিশার উন্মোচন।

উপেন্দ্রকিশোর টুনটুনির বইয়ে ছবি আঁকার আগেই কিন্তু বাংলায় ছোটদের পত্রিকায় ছবি ছাপা হত। 'সখা'। 'সখা ও সাথী', 'মুকুল', 'বালক' এই সব বইয়ের পাতায় ছবি দেখা যেত। কিন্তু সেই ছবির জৌলুশ ছিল না। কাঠখোদাই বা স্লাতেখোদাইয়ের ওই সব ছবি উপেন্দ্রকিশোর আবিষ্কৃত পদ্ধতির থেকে একদম আলাদা ও পুরনো। তখন বাংলা বই ও পত্রিকাতে ভাল ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা ছিল না। ছবিগুলোকে যাতে সুন্দর ভাবে ছাপিয়ে শিশু মনের জন্যে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে উপেন্দ্রকিশোর বিলেত থেকে অনেক খর্চা করে হাফ টোন ছবি ছাপাবার যন্ত্রপাতি আনালেন। এই সব জিনিস রাখবার জন্যে একটু বড় ঘরের দরকার হল। যার ফলে তিনি বাড়িও পরিবর্তন করলেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে উঠে গেলেন ৭ নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে। পুন্যলতা চক্রবর্তী তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলোতে যা বলেছেন তার থেকেই স্পষ্ট যে উপেন্দ্রকিশোরের আত্মত্যাগ শুধুমাত্র গল্পে ছবির ব্যবহারকে সফল করার জন্যে , "মাঝারি রকমের বাড়ি তার মধ্যে একটা ঘরে বাবা স্টুডিয়ো তৈরি করলেন, আর একটা ঘরে ছোট একটা ছাপার প্রেস বসল, আর একটা ঘরে ও বারান্দায় নানারকম যন্ত্রপাতি রাখা হল। স্নানের ঘরকে করা হল ডার্করুম"।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন মুদ্রণ শিল্প জগতে একজন বাঙ্গালি আবিষ্কারক। হাফ টোন আর লাইন ব্লক নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন। আগে হাফ টোন ছবি পরিস্কার ভাবে আর মোলায়েম করে ছাপাবার অনেক অসুবিধা ছিল। তিনি সেই অসুবিধা দূর করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যার ফলে হাফ টোন ছবি হল আরো সুন্দর ঝকঝকে ও মসৃণ। তিনি আবিষ্কার করলেন ক্যামেরার স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার, যার ফলে ক্যামেরার স্ক্রিনকে যান্ত্রিক উপায়ে ক্যামেরার ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে রাখা হল অনেক সহজ। ইউরোপের প্রিন্সরোজ কোম্পানি উপেন্দ্রকিশোরের অনুমতি নিয়ে ওই আবিষ্কারগুলির পেটেন্ট কিনে নেয় ও সেখানে বিক্রি শুরু করে। পেনরোজ অ্যানুয়াল পত্রিকায় সেসবের বিবরণ পাওয়া যায়। তেরো বছর ধরে এই সব পরিশ্রম করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও তিনিই এই আবিষ্কারগুলোর ফসল দিয়ে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' যা বাংলা প্রকাশনা জগতের এক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় পরে। শিশু সাহিত্যের সেরা সম্পদ 'টুনটুনির বই' প্রকাশিত হয় এখান থেকে ১৯১০ সালে এবং সেই থেকে এর জয়যাত্রা শুরু। টুনটুনির বইয়ের গল্প পড়ে তো পাঠক আগেই মুগ্ধ হয়েছিল যখন এর আগে তা সিটি বুক সোসাইটি থেকে বেরিয়েছিল কিন্তু এবারে তার সঙ্গে ছবি দেখে সবাই হল স্তম্ভিত। একের পর এক বেরোতে থাকল ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, আর তার সাথে অসামান্য হাফটোন ছবি। ১৯১৩-তে তিনি আরেক কালজয়ী পদক্ষেপ নিয়ে ফেললেন। ইউ রে অ্যাণ্ড সন্স থেকে বেরলো মাসিক সন্দেশ পত্রিকা যা শিশু সাহিত্যের জগতে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে নিজের। লেখার সাথে সাথে সন্দেশের মূল আকর্ষণ ছিল সাদা কালো ও রঙিন ছবি।

উপেন্দ্রকিশোর হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পীর মতো নিজের লেখা গল্পে নিজেই ছবি আঁকতেন কারণ অন্যের আঁকা ছবির সাথে তাঁর মনের ছবি মিলত না। সন্দেশ পত্রিকার প্রকাশের পর তার গ্রন্থচিত্রণের পূর্ণ প্রকাশ ঘটল। এলো নতুন চিন্তা। শুধু আঁকা আর লেখা নয়, ভাল ছাপা না হলে শিশুমন জয় হবে না। তাঁর এতদিনের গবেষণা পেল পরিপূর্ণ রূপ। ইউ রে অ্যান্ড সন্স থেকে ছাপা উজ্জ্বল ছবি এখনকার অতি আধুনিক অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা ছবির সাথে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। হাফটোন, কোয়ার্টার টোন আর লাইন ব্লক এই তিন রকমের মধ্যে লাইনে আঁকার প্রবণতা বেশি ছিল। কালিকলমের কারিকুরিতে চরিত্রগুলোর চেহারা অভিব্যক্তি হত একেবারে নিখুঁত। বিদেশী বড় শিল্পীদের পাশে তাঁর ছবি অনেক এগিয়ে থাকবে। লাইনের সাথে নানা রকম জাল এনে ছবির মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন। ডাক্তারির অ্যানাটমি বই দেখে তিনি মানুষ বা যে কোন প্রাণীর শরীর আঁকায় অদ্ভুত মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন সেই সময়। অন্য সব বইয়ে সেই সময় ছবিগুলো হত পুতুল পুতুল, থাকত না বাস্তবতা। উপেন্দ্রকিশোর তার থেকে বেরিয়ে চরিত্রগুলোর বাস্তবিক চেহারা আঁকা শুরু করলেন। এমনকি পৌরাণিক চরিত্র, নানা দেশের ঠাকুর দেবতার চরিত্র, রাজা-রানি, জীবজন্তু সব তাঁর কলমের তলায় হয়ে উঠল জীবন্ত। তাঁর লেখায় মানুষ আর জীবজন্তুর স্থান ছিল বেশি। টুনটুনির বইয়ে শেয়াল পন্ডিত, টুনটুনি পাখি, নরহরি দাস, মজন্তলি সরকার, বাঘমামা ছবিগুলো আজও জীবন্ত।

মুদ্রণ গবেষণায় হাফ টোন পদ্ধতি নিয়ে তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ইউরোপে স্বীকৃতি পেলেও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও বাঙালি তাঁকে সেরকম স্বীকৃতি দেয়নি এটা বড় আফসোস। উপেন্দ্রকিশোর আকস্মিক প্রকাশনায় ব্রতী হননি। নিজেকে তিলে তিলে তৈরি করার পরই আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রকাশনা শিল্পে। ছোটদের বই যেমন তেমন করে হেলাফেলায় ছাপা উচিত নয়। হাতে নিয়ে আকৃষ্ট না হলে ভুলেও সে বই ছোটরা পড়বে না, আজকের যুগের এই ধ্রুব সত্যটা তখন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর।

কমিউনিটি নিউজ

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের পিকনিক

সুস্মিতা সরকার

নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পিকনিক শুনলেই মনে হয় বন ভোজন বা চড়ুইভাতির কথা। যৌথ পরিবারে বড় হওয়ার জন্য বাইরের জগতকে আঁকড়ে ধরার একটা অদম্য বাসনা মনের মধ্যে সবসময় আনাগোনা করে। সে জন্য অগাষ্ট মাস পড়তে না পড়তেই আমরা মানে আমি স্নিগ্ধাদি আর চিত্তদা লেগে পড়ি পিকনিকের উৎযোগে।

এবারেও খুব সুন্দর ভাবে পিকনিকে আয়োজন করা হয়েছিল।

জলখাবার শুরু হল একপাশে শশা,পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা সহযোগে মুড়িমাখা, গরম গরম সিঙ্গারা আর চা অন্য পাশে ডিম, কলা, মাপ্তকিন আর কফি সাথে অন্তহীন আড্ডা। এদিকে দেবল এসে গেছে চিকেন গ্রীল করার সরঞ্জাম নিয়ে, শুরু হল দ্বিপ্রাহরিক ভোজন পর্বের আয়োজন। গ্রীলড চিকেন, টার্কি বার্গার, চিকেন ফ্র্যাঙ্ক সহযোগে হটডগ বান,পাস্তা স্যালাড, স্নিগ্ধাদির বীনস স্যালাড, তরমুজ আর অর্পিতার তৈরী বোঁদে। তারই মধ্যে চলছে সকলের অবিরত নানা রকম কথার জাল বোনা।

ইতিমধ্যে চিত্তদা বের করলেন তার অসাধারন ব্যাটারের এর ফিস ফ্রাই আর রায়তা। ভোজন রসিক বাঙালীর রসনার বাসনা মেটাতে পরম তৃপ্তিতে টপাটপ উঠে গেল মাছ ভাজা।

হঠাৎ দেখি হাসি হাসি মুখে হাজির পার্থ, সুদীপ্তা যদিও জানতাম ওদের আসতে দেরী হবে তবুও—।

সকাল থেকে নাটকের রিহারস্যাল করে এল। সব খাবার তোলা ছিল ওদের জন্য। ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রেকফাস্টের ওপর, ডিম, কলা, সিঙারা, মুড়িমাখা, মাপ্তকিন এবং ফিস ফ্রাই কিছুই বাদ পড়ল না অভুক্ত পেটের কবল থেকে।

হাসির হররা উঠল ওদের কান্ড দেখে।

এরপর এসে গেল পলি, চন্দ্র, ইন্দ্রাশীষ, সিমলী।

ইতিমধ্যে দেখি নন্দা তাঁর সুমধুর কণ্ঠে শুরু করেছেন স্বর্ণযুগের গান। মন চলে গেল সেই ৭০-এর দশকে।

এরই মধ্যে পার্থ সকলের ছবি তুলে চলেছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আঙ্গিকে। সে এক মজা, মেয়েরা হ্যাট, লিপস্টিক, সানগ্লাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওদিকে গরম কড়ায় ইন্দ্রাশীষ তখন পাঁপড় ভাজার আয়োজন করছে আর সিদ্ধার্থদা পাঁপড় ভাজার তদারকিতে ব্যস্ত। সেই সুযোগও পার্থ মিস করতে চায় না, আর সুদীপ্তাও রেডি সেই মুহূর্তটাকে ক্যামেরা বন্দী করতে। দুপুরের খাবার শেষ করে পুরুষরা তখন গাছের শীতল ছায়ার নিচে চেয়ার পেতে বসে গরম গরম তর্কে বিতর্কে মত্ত হয়ে পড়েছে, আর মেয়েরা গল্প গুজবে। তাস-লুডোর দিকে কারোরই মন নেই।

এই সময় গরম গরম রাতের খাবার নিয়ে বিজয় হাজির। পার্থ আর ইন্দ্রাশীষ দৌড়োলো কন্টেনার আনতে।

ওরা ধরাধরি করে কন্টেনার আনছে আমি ক্যামেরায় ধরে রাখলাম সেই ছবিটাকে।

৫.৩০ বাজে স্নিগ্ধাদি আমি খাবার সাজাতে শুরু করেছি, পাপিয়া বৌদি তড়িঘড়ি করে গ্রীন স্যালাড তৈরী করছেন। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ডিনারের অপেক্ষায়। গরম ভাত,পাপিয়াবউদির হাতের লেবুপাতা দিয়ে তৈরী মুসুরডাল, পাঁপড়ভাজা, পাঁচমেশালি তরকারি,মাংস, চাটনি এবং সর্বশেষে স্নিগ্ধাদির হাতে তৈরী রসোগোল্লা। সে যে কী পরিতৃপ্তি বলে বোঝাতে পারব না। এলাহি কান্ড। এরই মধ্যে আঙুল চাটতে চাটতে সুদীপ্তা আর পাপিয়াবউদি বললেন, এত ভাল লেগেছে যে বাড়ী নিয়ে যাব, এই বলে জিপ লকে ভরে ফেলেছে আমার তৈরী চাটনি।

খাওয়ার পর্ব চুকতে চুকতে বিকেল গড়িয়ে এল। এবার পরিস্কার করার পালা। সবাই এগিয়ে এল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, মুহূর্তের মধ্যে পিকনিকের জায়গা পরিস্কার করে যে যার গাড়িতে উঠে পড়লাম।

বাড়ী ফেরার পালা। সুর্যাস্তের লাল আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, মন ছুঁয়ে এক অনাবিল আনন্দের রেশ। আরো নতুন নতুন মানুষদের সমাগম হোক আমাদের আড্ডায় এই আকাঙ্খা নিয়ে ফিরে চললাম বাড়ীর পথে।

কমিউনিটি নিউজ

Press Release :

Aabaha Art and Theater Festival Enthralls Atlanta with a Unique Celebration of Culture and Creativity

Atlanta, GA – August 6, 2023

Kallol Nandi

Convenor, Aabaha Art and Theater Festival

The city of Atlanta bore witness to an extraordinary convergence of culture, creativity, and community at the inaugural Aabaha Art and Theater Festival, held on August 4th and 5th. Transpiring at the remarkable "The Eagle @ Sugar Hill" in Sugar Hill, GA, the festival transformed into a haven of theatrical brilliance and artistic expression, marking a historic milestone as the first-ever theater festival exclusively dedicated to the Indian Subcontinent immigrant communities.

This unprecedented event served as a beacon of cultural diversity and unity, as immigrants from the Indian Subcontinent utilized the compelling medium of theater to share their stories, heritage, and experiences. The festival facilitated a seamless cultural exchange through performances in three languages – Bengali, Hindi, and English – effectively transcending linguistic boundaries. Beyond captivating performances, the Aabaha Art and Theater Festival provided an unparalleled platform for cultural exploration and profound conversations.

The festival's opening night set the stage ablaze with the touching Hindi play "Aadhe Adhure," masterfully presented by the Atlanta-based Dhoop Chaoon Hindi Theater Group. The following evening witnessed a stirring performance titled "Darj Lamhe Khudkushi Ke" by the Hindi Rangmanch group from North Carolina, delving into the intricate tapestry of human emotions.

The second day of the festival was an immersive journey through Bengali, Hindi, and English dramas, encompassing a range of narratives. From the thought-provoking "Durghatana (Accident)" by Chicago Natyogoshthi to the emotionally charged "An Emotional Cripple" by Mandi Theater from Chicago, IL, the festival offered a mosaic of perspectives. "Five Grains of Rice" by Ebong Theatrix from Washington DC provided an immersive theatrical experience, while "Ekti Obastab Golpo (An Implausible Story)" by Atlanta Theater Workshop, GA, and "Khela (The Play)" by Songlaap from Cleveland OH, unveiled captivating Bengali viewpoints.

The crescendo of the festival arrived with the premiere play "Confession," an emotionally stirring performance presented by the festival's organizers, Aabaha. This poignant production resonated deeply, leaving an indelible impression and embodying the festival's core values of cultural education and inspiration.

Beyond the realm of theater, the festival enriched attendees with a thought-provoking panel discussion on August 6th. Theater enthusiasts and artists engaged in meaningful dialogues, sharing their personal journeys and addressing the evolving role of theater in the lives of Indian Subcontinent immigrants in the USA.

As the curtains descended and applause reverberated through the venue, attendees embarked on a sensory voyage, savoring delectable ethnic cuisine. Amidst bites of flavorful dishes, discussions flourished about the performances, the narratives they conveyed, and the techniques that breathed life into them. These conversations organically evolved into captivating interactions with directors and actors, offering

a unique opportunity for attendees to gain insights into the intricate realm of theater production.

The intermission between plays transformed into a hub of enlightenment and understanding, where participants delved into the depths of each production's narrative, symbolism, and creative choices. Directors shared their inspirations and challenges, while actors illuminated the process of bringing characters to life. Engaging dialogues unfolded, transcending cultural boundaries and creating an atmosphere of cross-cultural exchange.

Amidst the fervor of theater, an art exhibition showcased the talents of the local community, boasting breathtaking oil paintings, watercolors, collages, and wood crafts. This visual spectacle provided an opportunity for guests to immerse themselves in the creative minds of the artists, exploring the visual language of culture and expression.

The synergy of the art exhibition and culinary delights cultivated a cultural milieu that facilitated organic conversations about life, traditions, and the potent influence of storytelling. Attendees from diverse backgrounds united over shared experiences, unraveling new perspectives and enriching their understanding of different cultures.

Brandon Hembree, Mayor of the City of Sugar Hill, graced the festival as the Guest of Honor, and despite language barriers, his sentiment resonated: "You don't have to understand the language in order to see beauty in the field of emotion, that was especially the case in the last performance. I have enjoyed my time here today and I just wanted to thank you for bringing the outside world to our community."

Kallol Nandi, the visionary convener of the festival, extended heartfelt appreciation to the participating theater groups and Aabaha members for their unwavering dedication in bringing this event to fruition. The festival's visionary tagline, "Using theaters for cultural education, entertainment, and inspiration of the community, create a platform for cultural exchanges among people of diverse ethnicities and build a bridge between the Mainstream and Immigrants," reverberated powerfully throughout the event.

As the inaugural Aabaha Art and Theater Festival culminated, it etched an enduring mark on Atlanta's cultural landscape, foreshadowing a future adorned with artistic exploration, unity, and shared experiences. The resounding success of the Aabaha Art and Theater Festival not only spotlighted the exceptional theatrical talent of the Indian Subcontinent but also showcased the extraordinary potential of art to serve as a bridge, fostering connections between diverse communities.

For additional information and captivating visuals, please visit:

https://www.aabaha.org/aabaha-art-and-theater-festival-2023/"Confession"

Rules for submitting articles to Sangbad Bichitra

Submit only one text at a time in any one category.

Send articles to this email:

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

1) Poems should be within 12-20 lines.
2) Short poems should be within 6-8 lines.
3) Short stories should be between 250-500 words.
4) Stories should be at least 1200 words but no more than 1500 words.
5) Essays/articles related to literature, science and social issues should be less than 500 (for an article) to 1000 (for an essay) words.
6) News form within your local community about art, culture, etc. should be within 100-500 words. Success stories of your next generation young members on any arena can be shared.
7) The text should be formatted in Avro font and stored as a MS Word (.docx) file. Handwritten content, an image (like JPEG or a PDF) file are not suitable formats and submissions will not be accepted.
8) Content should be previously unpublished and original.
9) Content should be free from typographical and grammatical errors.
10) Any content directly commenting on a political party, religion, caste, nation or a particular individual in a biased positive or negative manner will not be accepted for publication.

* Please understand that if the submitted content does not confirm to the guidelines set forth above (especially word limit), it will not be accepted for publication (due to space constraints of a 16-page magazine).
* This is a publication focused on community(ies) and our main aim is to publish news from any organization that promotes Bengali art and culture. As local Bengali organizations submit content to us, we will strive to publish items accordingly.
* Your opinion is important to us : Please provide your review (via email) of the contents of "Sangbad Bichitra" as it tackles pertinent subjects and viewpoints and their manner of presentation. If there is any room for improvement, please do not hesitate to describe them briefly and we shall publish your feedback in our subsequent edition.

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

সংবাদ বিচিত্রায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

যে কোনো একটি বিভাগে একবারে একটিই লেখা পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ইমেল

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

১) কবিতা পাঠাবেন একটি ১২-২০ লাইনের মধ্যে।

২) অনু কবিতা পাঠাবেন একটি ৬-৮ লাইনের মধ্যে।

৩) অনুগল্প পাঠাবেন ২৫০-৫০০ শব্দের মধ্যে।

৪) গল্পটিকে নুন্যতম ১২০০ এবং সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৫) সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ / নিবন্ধ পাঠাবেন ৫০০ (নিবন্ধ) থেকে ১০০০ (প্রবন্ধ) শব্দের মধ্যে।

৬) শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক কমিউনিটি নিউজ পাঠাবেন ১০০-৫০০ শব্দের মধ্যে। আপনার কমিউনিটির পরবর্তী প্রজন্মের যে কোনও বিষয়ে সাফল্যের খবর দেওয়া যাবে।

৭) লেখাটি অভ্রতে টাইপ করে একটি .docx ফাইলে পাঠান। হাতে লিখে, pdf করে, ছবি তুলে পাঠালে গৃহীত হবে না।

৮) লেখাগুলিকে অবশ্যই যে কোন মাধ্যমে অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

৯) বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে লেখকদের সতর্ক থাকতে হবে।

১০) লেখায় সরাসরি যে কোন রাজনৈতিক দল, ধর্ম, জাতি, জনজাতির উল্লেখ থাকলে বা কোনো বিতর্কমূলক লেখা অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম করে বা ইঙ্গিত করে সম্মানহানির প্রয়াস থাকলে সেটি বিবেচিত হবে না।

মনে রাখবেন নিয়মাবলী মেনে লেখা না পাঠালে বা শব্দসংখ্যা বেশি থাকলে লেখা প্রকাশ সম্ভব নয় কারণ মাত্র ১৬ পাতার পত্রিকা এটি।

এটি বিশেষত সংবাদ পত্রিকা তাই কমিউনিটি নিউজ প্রকাশ আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের সাথে যুক্ত যে কোনও সংস্থার সংবাদ আমরা প্রকাশ করব। আপনারা আপনাদের সংস্থার কর্মকান্ডের সংবাদ পাঠান, সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা বিবেচিত হলে আমরা সেইটি ছাপব।

আপনাদের মতামত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

সংবাদ বিচিত্রা পত্রিকাটি বিষয় ভিত্তিক এবং আঙ্গিক ভিত্তিক পর্যালোচনা করে আপনাদের কেমন লাগছে ইমেলে জানান। যদি কোথাও পরিবর্তন বা উন্নতিসাধন করতে হয় সংক্ষেপে দু-চার লাইনে ইমেল করে কারণ সহ জানাবেন আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করব।

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

Advertisement Rates for Sangbad Bichitra - 2023

(Color – Back Page)		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page	(14 x10 inch)	$250	$1,500	$2,500
1/2 Page	(10 x 7 inch)	$150	$750	$1,250
1/4 Page	(5 x 4 inch)	$100	$500	$1,000
1/8 Page	(5 x 2 inch)	$50	$250	$500

(Color – Inside)		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page	(14 x10 inch)	$150	$1,000	$2,000
1/2 Page	(10 x 7 inch)	$100	$500	$1,000
1/4 Page	(5 x 4 inch)	$75	$250	$500
1/8 Page	(5 x 2 inch)	$35	$150	$300

- Minimum three (3) issues.
- Payment is required in advance.
- Make check payable to : CAB
- Mail to :
  Cultural Association of Bengal
- Address :
  346 Yale Road, Garden City,
  NY 11530, USA
- Zelle to : 516-965-5277